তটরেখা

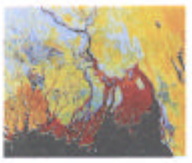

PDO-ICZM -এর ত্রৈমাসিক বুলেটিন, PDO-ICZM সংখ্যা - ৬ এপ্রিল-জুন ২০০২

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীতে DFID'র সহায়তা

DFID, বাংলাদেশ Program Development Office -এর মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার একটি সমন্বিত কর্মসূচী উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে। এ সহায়তার উদ্দেশ্য তিনটি-

ক) PDO-এর মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে বৃহত্তর উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করা;

খ) DFID, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে (বিশেষ করে চর কর্মসূচীতে অর্জিত অভিজ্ঞতা) কাজে লাগিয়ে সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা (ICZM) প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা ছক তৈরী করা - বিশেষ করে জীবিকা, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং বেসরকারী খাত সংযোগ সমূহে; এবং

গ) উপকূল এলাকায় বিনিয়োগ (প্রাথমিক ভাবে RNE এবং বাংলাদেশ সরকারের সাথে যৌথভাবে) সুযোগ সমূহ চিহ্নিত করা।

DFID, বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ মোট ৬ লাখ পাউন্ড এবং এ অর্থ ১৮ মাসে দেয়া হবে। এ অর্থ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডের দূতাবাস এবং ডিএফআইডি, বাংলাদেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ডিএফআইডি'র সহায়তা মূলতঃ ৪টি কাজে ব্যবহৃত হবে। এগুলো হচ্ছে ঃ

- পরামর্শক টিমের জন্য সহায়তা : প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রশাসন, পল্লী-জীবিকা এবং বেসরকারী খাত উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরামর্শকের ব্যবস্থা করা হবে।

- স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মত বিনিময় : এ মত বিনিময় শুধু মাত্র একবার কিংবা অল্প কিছু সময়ের মধ্যে সীমিত না রেখে উপকূলবর্তী এলাকার জনগণ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশেষ করে এ প্রক্রিয়া PDO কে স্থায়ী কাঠামো গড়তে সক্ষম করে তুলবে, স্থানীয় জনগণ ও প্রতিষ্ঠানকে ICZM পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অংশীদার করে তুলবে।

-জ্ঞান ব্যবস্থাপনা : নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন এবং অব্যাহতভাবে শিক্ষা লাভের নীতি বাস্তবায়নের ওপর ICZM প্রচেষ্টার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করবে। বিশেষ করে এ প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট জ্ঞান অর্জন ও তা বিতরণে অঙ্গীকার। এ ক্ষেত্রে একটি ডেটা বেইজ তৈরী ও প্রয়োজন।

- অনির্ধারিত তহবিল - ICZM পরিকল্পনা প্রক্রিয়া তৈরীর উদ্দেশ্যে পরিচালিত কর্মকান্ডে এ তহবিল কাজে লাগানো হবে। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হবে - বর্তমান কর্মকান্ডের আওতাভুক্ত নয় এমন নতুন বিষয়ের মূল্যায়নে এ তহবিল ব্যবহার করা।

এ সংখ্যায় আরো রয়েছে -

উপকূলীয় অঞ্চল নির্ধারণের নীতি ও প্রচেষ্টা

হামিদার পরিবার দারিদ্য থেকে মুক্ত ঃ পটুয়াখালী - বরগুনা একুয়াকালচার এক্সটেনশন প্রজেক্ট

বাংলাদেশের জলসীমায় সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষণ

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প : দিক নির্দেশনা প্রয়োজন

উপকূলীয় অঞ্চল, এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন, ২০০২ (CZAP-২০০২)

১২-১৬ মে, ২০০২, ব্যাংকক, থাইল্যাণ্ড

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার উপকূলীয় অঞ্চল সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন সম্প্রতি ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হয়। সকলের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য ৪০টি দেশ থেকে ২শ'রও বেশী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষক, নীতিনির্ধারক, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গ্রুপ এবং জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এ সম্মেলনে সমবেত হয়েছিলেন। আলোচনার মূল বিষয়গুলো ছিলো - (১) টেকসই উপকূলীয় কর্মকান্ড; (২) উপকূলীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা; (৩) স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং সম্পদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া; (৪) উপকূলীয় সম্পদ অর্থনীতি এবং টেকসইযোগ্যতা; (৫) উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনা; এবং (৬) সমন্বিত নীতিমালা।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম, ড. শামসুল হুদা, ড. এম এ গনি, ঢালী আব্দুল কাইয়ুম, সাইদ ইফতেখার

চারটি কর্ম অধিবেশন এবং ১০টি কারিগরি অধিবেশনে মোট ৬৮টি মৌখিক উপস্থাপনা করা হয়। প্রায় ৫০টি পোস্টারও এতে প্রদর্শিত হয়। বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধিদল সম্মেলনে যোগদান করে (ছবি)। সম্মেলন চলাকালে শিক্ষার ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়ে একটি কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়।

PDO-ICZM এ সম্মেলনের অংশীদার এবং বাংলাদেশে এ সম্মেলনের স্থানীয় সংযোগ।

CZAP-২০০২ সম্মেলনের কাগজপত্র PDO লাইব্রেরীতে রয়েছে। সম্মেলনের কার্য বিবরণী CD-ROM -এ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

CZAP-২০০৪ সম্মেলন অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত হবে।

উপকূলীয় অঞ্চলের জীবিকা-বিশ্লেষণ চলছে

PDO-ICZM উপকূলীয় অঞ্চলে জীবিকা-বিশ্লেষণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা নিয়েছে। এ বিষয়ে সরাসরি স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের ধারণা কি তা নিয়ে একটি সমীক্ষা এখন চলছে। চেকলিষ্ট ভিত্তিক সাক্ষাতকার, গ্রুপ কর্মশালা এবং বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত এ সমীক্ষা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। দু'জন গবেষকের একটি দল PDO-এর সিনিয়র সদস্যদের সাহায্য নিয়ে এখন তথ্য সংগ্রহ করছেন। তারা উপকূলবর্তী অঞ্চলের কিছু কিছু জায়গা পরিদর্শন করছেন।

এ সমীক্ষা চালাতে বিভিন্ন অংশীদার সংগঠনের সাহায্য নেয়া হচ্ছে। এদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প এবং এনজিও রয়েছে। খুলনার KJDRP এলাকায় CEGIS তদারককারী দল, সুন্দরবন বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন প্রোজেক্ট, সুন্দরবনে কর্মরত সুশীলন, খুলনা শহর এলাকায় কর্মরত ব্র্যাক, পটুয়াখালী-বরগুনা একুয়া কালচার এক্সটেনশন প্রোজেক্ট (PBAEP), পটুয়াখালীতে কর্মরত CODEC, চর উন্নয়ন ও সেটলমেন্ট প্রকল্প-২ (CDSP-II), নোয়াখালীর সাগরিকা এবং লক্ষীপুরের NRDS এদের মধ্যে অন্যতম।

অংশীদার এ সংগঠনগুলো সমীক্ষার জন্য গ্রাম এবং বাড়ীগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করে থাকে। তারা প্রত্যেক সমীক্ষা এলাকায় সাক্ষাতকার শেষে যে মূল্যায়ন কর্মশালা হয় সেগুলো আয়োজনেও সাহায্য করে। সমীক্ষা দলটি জুলাই মাসে চকোরিয়া, মহেশখালী, কতুবদিয়া এবং চট্টগ্রাম সফর করবে। সমীক্ষা কাজ আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর এর ফল বিশ্লেষণ কাজ আগামী সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

উপকূলীয় অঞ্চলের সীমা ও ব্যাপ্তি নির্ধারণের প্রচেষ্টা

পটভূমি : দীর্ঘ দিন ধরে উপকূলীয় অঞ্চলের সংজ্ঞা এবং সীমা নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা চলছে এবং এ ব্যাপারে নানা মত রয়েছে। যে কোন একটি দিক বিবেচনায় নিলে ব্যাপারটা সহজ। উদাহরণ স্বরূপ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এ ব্যাপারে নিজস্ব সংজ্ঞা ব্যবহার করে। তবে, একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপকূলীয় অঞ্চলের সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রচেষ্টা শুরু হয় আশির দশকের গোঁড়ার দিকে। ভূউপরিতল এবং পানি বিজ্ঞানের জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে Coastal Environmental Management Plan for Bangladesh (CEMP) (UN/ESCAP ১৯৮৮) বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং খুলনা-এ পাঁচটি জেলাকে উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করেছে। অনেকগুলো বিকল্প সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ সরকার এর ওপর নীতিমালা পত্রে (ICZM Policy note 1999) উল্লেখ করে, "উপকূলবর্তী এলাকা গঠন এবং বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে নানামুখী। শুধুমাত্র স্থানগত সীমা নির্ধারণ দিয়ে এর সংজ্ঞায়ন সম্ভব নয়। ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনাকে মূল লক্ষ্য ধরে আমরা বাংলাদেশের স্বীকৃত প্রশাসনিক সীমানা অনুযায়ী উপকূলীয় অঞ্চলকে চিহ্নিত করতে পারি এবং উল্লিখিত পাঁচটি জেলাকে উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।" অবশ্য নীতিমালা পত্রে উপকূলীয় অঞ্চলের সমুদ্রের দিকের সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। PDO-ICZM (২০০১) এর Inception রিপোর্ট এ EEZ সীমানাকে সমুদ্রের দিকের সীমানা এবং মোহনামুখী ১৬টি জেলাকে উপকূলীয় অঞ্চলের স্থলমুখী সীমানা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

প্রেক্ষাপট : তবুও উপকূলীয় অঞ্চল সংক্রান্ত এ আলোচনা চলতে থাকে এবং তা এমনকি ICZMP এর টেকনিক্যাল কমিটিতেও ওঠে। উপকূলীয় অঞ্চলের চিত্রায়নকে আরো সুক্ষ্ম করা এবং আরো ব্যাপক মানদণ্ডের মাধ্যমে একে উপ-অঞ্চলে ভাগ করার উদ্দেশ্যেই নতুন এ প্রচেষ্টা।

উপকূলীয় অঞ্চলের সংজ্ঞায়ন, চিত্রায়ন এবং একে উপ-অঞ্চলে ভাগ করার মানদণ্ড তৈরী করতে গিয়ে আমরা আলাস্কা, নিকারাগুয়া, নেদারল্যাণ্ড, জার্মানী, ভারত এবং শ্রীলংকায় ব্যবহৃত এ সংক্রান্ত সংজ্ঞা এবং পদ্ধতির পর্যালোচনা করেছি।

পদ্ধতি : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, স্থলভাগের ওপর সমুদ্রের প্রভাবের ক্ষেত্রে জোয়ার ভাটার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জোয়ারের ফলে ভূগর্ভস্থ এবং ভূমির উপরিতলের জলের মাধ্যমে স্থলভাগে লবন আসে যা দেশের কৃষি-অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং জলোচ্ছাসের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের ঝুঁকির মাত্রা স্থলভাগের দিকে সমতল ভূমি থাকার কারণে যে সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে তার চেয়ে বেশী হয়। লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ, জোয়ার এবং সাইক্লোন-ঝুঁকির ওপর ভিত্তি করে আমরা স্থলভাগের দিকে উপকূলীয় অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণের চেষ্টা করেছি।

মাটিতে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ, সাইক্লোন ঝুঁকি এবং জোয়ারের মাত্রা বিশ্লেষণ করা হয়েছে দেশের দক্ষিণার্ধের প্রত্যেকটি উপজেলার ক্ষেত্রে সূচকের ব্যবহার করে। কোড-কৃত সূচকের মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপজেলাগুলোর ছক তৈরী করা হয়েছে। যে সব উপজেলা ১ কিংবা তার বেশী মূল্যমান পেয়েছে তাদেরকে উপকূলীয় অঞ্চলের সীমানায় বিবেচনা করা হয়েছে। একটি জেলায় কেবল একটি উপজেলায় ১ কিংবা তার বেশী মূল্যমান পেলেই প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত কারণে পুরো জেলাকেই উপকূলীয় অঞ্চলের সীমানার আওতাভূক্ত করা হয়েছে।

প্রস্তাব : আরো কিছু যাচাই-এর শর্তে বর্তমানে সর্বমোট ১৯টি জেলাকে (উল্লিখিত ১৬টি জেলার সাথে যশোর, নড়াইল এবং গোপালগঞ্জ জেলা) উপকূলীয় এলাকা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। EEZ কে সমুদ্রমুখী সীমানা ধরা যেতে পারে, এর ফলে গভীর সমুদ্রে উন্নত ব্যবস্থাপনা, মাছ ধরা এবং গ্যাস অনুসন্ধানে অধিকতর ক্ষমতা অর্জন সম্ভব হবে। স্থলভাগ, মিঠাপানি এবং সামুদ্রিক পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া অনুযায়ী উপকূলীয় এলাকাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়–

সমুদ্রমুখী এলাকার যে সমস্ত উপজেলা সরাসরি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত এবং উল্লিখিত মিথস্ক্রিয়ায় সরাসরি প্রভাবিত এবং সরাসরি ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রভাবিত এলাকা ঃ সমুদ্রমুখী এলাকায় পার্শ্ববর্তী উপজেলা সমূহ যেগুলো সরাসরি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত নয়, তবে সমুদ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব পায় এবং কিছুটা ঝুঁকিরও অংশীদার হয়।

বাফার এলাকা ঃ যে সমস্ত উপজেলা উপকূলীয় ১৯টি জেলায় অবস্থিত কিন্তু সমুদ্রমুখী প্রভাবিত এলাকার কিংবা অর্ন্তভুক্ত নয়, সেগুলোকে বাফার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ উপজেলাগুলোর ওপর সমুদ্রের প্রভাব ও ঝুঁকি অনেকটা পরোক্ষ।

সমুদ্রমুখী এবং প্রভাবিত এলাকা যৌথ ভাবে উপকূলীয় অঞ্চল গঠন করে। উপকূলীয় অঞ্চলকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানদণ্ড অনুযায়ী নিম্নলিখিত উপ-অঞ্চলেও ভাগ করা যায় ঃ

–ভূতত্ত্ব এবং জলবৈশিষ্টের ওপর ভিত্তি করে বিভাজন;

–পরিবেশগত ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে বিভাজন (উদাহরণ স্বরূপ ম্যানগ্রোভ, গঙ্গা অববাহিকা-কিংবা কৃষি পরিবেশ গত অঞ্চল);

–ঝুঁকির ওপর ভিত্তি করে বিভাজন (উদাহরণ স্বরূপ, সাইক্লোন ঝুঁকি এলাকা, ভাঙ্গন এলাকা ইত্যাদি);

–উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বিভাজন (যেমন দরিদ্র, অতি দরিদ্র ইত্যাদি);

–তাদের পেশার ওপর ভিত্তি করে বিভাজন (যেমন চিংড়ি চাষ, লবন খামার, বন্দর, ইপিজেড ইত্যাদি);

এ বিষয়ে আগ্রহী নাগরিকদের মতামত এবং প্রস্তাব PDO- ICZM-স্বাগত জানাবে (pdo@iczmpbd.org)

একটি PDO-ICZM নিবন্ধ

হামিদার পরিবার সমন্বিত একুয়া কালচারের মাধ্যমে দারিদ্রমুক্ত হয়েছে

হামিদা আর ফোরকান মাঝি তাদের চার সন্তান নিয়ে পটুয়াখালীর বল-ভপুর গ্রামে বাস করে। তাদের কোন চাষের জমি নেই, আছে কেবল বসত বাড়ী আর একটি পুকুর যা ফোরকান তার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। ফোরকান রিকসা চালায়। ১৯৯৯ সালে যখন মৎস্য অধিদপ্তরের ডানিডা-পটুয়াখালী-বরগুনা একুয়া কালচার সম্প্রসারণ প্রকল্পের (PBAE) মাঠকর্মী শিউলি চক্রবর্তী বল-ভপুর গ্রামের অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করে তারা তাদের পুকুর গুলোর উন্নয়ন, বসতবাড়ীতে হাঁস মুরগী পালন এবং শাক-সব্জী চাষে আগ্রহী কিনা তখন ফোরকানের পরিবার সমন্বিত পুকুর চাষ সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ গ্রুপের সদস্য হয়।

হামিদা ৬টি প্রশিক্ষণ অধিবেশনের সবক'টিতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ফোরকানকে জীবিকার জন্য রিকসা চালাতে হয় বলে সে চারটি অধিবেশনে যোগ দিতে পারে। সে প্রতিদিন রিকশা চালিয়ে ৪০ টাকার মত উপার্জন করতো। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার পরিবার শিখতে লাগলো কিভাবে পুকুরের ভেতরে ও এর আশে পাশের জায়গা মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী পালন ও শাক-সব্জী উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। প্রশিক্ষণের আগে তারা পুকুরে একসঙ্গে অনেক পোনা মাছ ছাড়তো। কিন্তু পুকুরে খাদ্য স্বল্পতার কারণে মাছের বৃদ্ধি ছিল খুব সীমিত। এখন হামিদা ১ বর্গমিটারে ১টি পোনা মাছ ছাড়ে। এখন সে জানে পুকুরের ছোট ছোট উদ্ভিদের জন্য সূর্যের আলো কত উপকারী এবং এও জানে হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা এবং গোবর মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরীতে ব্যবহৃত হতে পারে।

গত বছর তারা ৪৮০ বর্গমিটার পুকুরে ১৫৭ কেজি মাছ উৎপাদন করেছে। এর মধ্যে তারা নিজেদের খাবারের জন্য ব্যবহার করেছে ৫০ কেজি, বাকীটা ৬০০০ টাকা মূল্যে বিক্রি করেছে। তাদের ১৬টি হাঁস এবং মুরগী রয়েছে। এদের বিষ্ঠা পুকুরে সার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের ডিম বিক্রির আয় থেকে হামিদা তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এবং অন্যান্য জরুরী খরচ মেটায়। গত বছর তার উৎপাদিত শাক-সব্জী ঘরের প্রয়োজন মিটিয়েছে এবং অতিরিক্ত সব্জী সে ৮০০ টাকা মূল্যে বিক্রি করেছে।

এ পর্যন্ত ৬৮,০০০ মানুষ (৩৪,০০০ পরিবার থেকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা) এভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং এদের ৮০% এ উৎপাদনশীল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছে। ১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১,১০০ হেক্টর পরিমাণ জলাশয় এলাকা (২৭,৫০০ ছোট পুকুর) উন্নত চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে প্রকল্প এলাকায় বছরে ২,০০০ টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে যার মূল্য ২০ লাখ মার্কিন ডলার। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আগে এ এলাকার বসত বাড়ী সংলগ্ন পুকুরগুলো হেক্টর প্রতি গড়ে ৫০০ কেজি মাছ উৎপাদিত হতো। এখানকার পুকুরগুলো খুব ছোট–৪০০ বর্গমিটারের মতো এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হতো না। হয় অল্প জায়গায় বেশী মাছ চাষ করা হতো (যেমন হামিদার পুকুরের ক্ষেত্রে) নয়তো মাঝে মাঝে বিক্রি কিংবা বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য খুব অল্প পরিমাণ মাছ চাষ করা হতো। গ্রামের দরিদ্র জনগণের বার্ষিক আয়ের মাত্র ৫ শতাংশ আসে মাছ উৎপাদন থেকে। কিছু সহজ কৌশল অনুসরণ করে সীমিত এবং সহজলভ্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণ মৎস্য উৎপাদন ৫ গুণ বাড়াতে পারে (একটি সাধারণ ছোট পুকুরে বছরে মৎস্য উৎপাদন ২০ কেজি থেকে বাড়িয়ে ১০০ কেজি পর্যন্ত করা যায়)। সমন্বিত চাষ পদ্ধতি কৃষকদের সীমিত সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। উপার্জনের বহুমুখীনতার ফলে তাদের জীবিকার ঝুঁকিও কমে।

পটুয়াখালী-বরগুনা মৎস চাষ বর্ধিত প্রকল্পের একটি কর্মসূচী

আমরা যখন হামিদার বাড়ীতে যাই, হামিদা আমাদেরকে দেখে বলে, "আমাদের তো চেয়ার নেই- আপনাদের কোথায় বসতে দেই?" তার স্বামী রিকসা চালাতে বাইরে গেছে। তবে হামিদা খুবই সামাজিক এবং সহযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন মহিলা। সে জাল ফেলতে জানে এবং তার পুকুরে জাল ফেলে আমাদেরকে মাছ দেখালো। আগে ফোরকান ভাড়া নিয়ে রিকসা চালাত। মাছ বিক্রির আয় দিয়ে সে দু'টি পুরনো রিকসা কিনেছে। এখন সে একটি রিকসা থেকে প্রতিদিন ৭০ টাকা আয় করছে। আরেকটি রিকশা ভাড়া দিয়ে আয় করছে ৩০ টাকা। হামিদা এখন PBAE-এর সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রশিক্ষক শিউলী চক্রবর্তীর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ তার সাফল্যের পেছনে শিউলী চক্রবর্তীর নিবিড় সহযোগিতা রয়েছে।

বাংলাদেশের জলসীমায় সামুদ্রিক কচ্ছপের সংরক্ষণ

সামুদ্রিক কচ্ছপ, একটি প্রাচীন প্রাণী যা আজ পৃথিবীব্যাপী হুমকীর সম্মুখীন। পৃথিবীর জলসীমায় বিচরণকারী সামুদ্রিক কচ্ছপের ৭টি প্রজাতি রয়েছে। CITES (Convention of International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora)-এর তালিকায় সব প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপের নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সমতল পৃষ্ঠদেশ বিশিষ্ট একটি প্রজাতি ছাড়া বাকীদের নাম CMS (Convention on the Conservation of Migratry Species of Wild Animals)-এর ১ ও ২ নং তালিকায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

প্রধান হুমকি সমূহ ঃ
- নদী ভাঙ্গন এবং পরিবর্তন
- মাছ ধরার জাল ও নৌকা
- বাসা নিধন ও ডিম চুরি
- অধিকহারে মাছ ধরা
- শিল্প কারখানা স্থাপন

স্মরণাতীত কাল থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমের সুন্দরবন থেকে সেন্ট মার্টিনসসহ সমগ্র দক্ষিণপূর্ব সমুদ্রতীরবর্তী ৭১০ কিলোমিটার এলাকার বালুময় সৈকতে সামুদ্রিক কচ্ছপ বাসা বানিয়ে আসছে। বাংলাদেশের সমুদ্র জলসীমায় ৫ ধরণের সামুদ্রিক কচ্ছপের দেখা পাওয়া যায়- এগুলো হচ্ছে Olive Ridely, Green turtle, Hawks bill turtle, Loggerhead turtle-এবং Leatherback turtle.

অতীতের তুলনায় বর্তমানে প্রতিদিন বাংলাদেশের জলসীমায় সামুদ্রিক কচ্ছপের সংখ্যা অধিকহারে হ্রাস পাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে কচ্ছপের ডিম চুরি, মাছ ধরার জালের মাধ্যমে কচ্ছপ নিধন এবং অন্যান্য কচ্ছপ নিধনকারী কার্যকলাপ। বেশীরভাগ হুমকিই মনুষ্য-সৃষ্ট। আজকাল বেশীরভাগ সময় অলিভ রিডলি প্রজাতি এবং মাঝে মাঝে Green turtle বাংলাদেশের সৈকতে বাসা বাঁধতে আসে। লেদারব্যাক প্রজাতির একটি কচ্ছপ বাংলাদেশে শেষ দেখা গিয়েছিল ১৯৯৮ সালে। কচ্ছপ আসলে বাসা বাঁধছে কিনা তা তদারকির তেমন ব্যবস্থা নেই।

যা হোক, সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বেশ কিছু সামুদ্রিক কচ্ছপ বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্বে টেকনাফ দ্বীপে এবং দক্ষিণ পশ্চিমে সুন্দরবন এলাকার সমুদ্র তীরে বাসা বাঁধে। বাসা বাঁধার উপযোগী সৈকতের সংখ্যা বর্তমানে বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর পরেও কচ্ছপের বাসযোগ্য কিছু কিছু এলাকা রয়েছে বিশেষ করে, সমগ্র সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, টেকনাফ উপজেলার শাহপরী দ্বীপ, উখিয়া উপজেলার ইনানি, হিমছড়ি সৈকত এবং সোনাদিয়া দ্বীপ, কক্সবাজার সদর উপজেলার কুতুবদিয়া দ্বীপ এবং খুলনা জেলার ডিমেরচর এবং দুবলার চর। বাংলাদেশের জলসীমায় যে কচ্ছপ পাওয়া যায় সেগুলোর সংরক্ষণে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী।

এ পর্যন্ত যা করা হয়েছে

বছর	ডিম সংরক্ষণ	বাচ্চা ফুটিয়ে সমুদ্রে ছেড়ে দেয়া
অক্টো. '৯৮-জুন '৯৯	নাম মাত্র	২১১৪
জুলাই '৯৯-জুন '০০	১১৬০৪	৭৯২৮
জুলাই '০০-জুন '০১	১৩৫৪৮	৮৩৬৩
জুলাই '০১- মে '০২	২৩১৮৮	১৬৭৬৪
মোট	৪৮৩৪০	৩৫১৬৯

CNRS (Centre for Natural Resources Studies) বাংলাদেশের জলসীমায় সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষণের লক্ষ্যে -১৯৯৮ সাল থেকে সেন্ট মার্টিনস ও টেকনাফে কর্মসূচী শুরু করেছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ৩৫ হাজারেরও বেশী কচ্ছপ ছানাকে তাদের আদি আবাস সমুদ্রে ছেড়ে দেয়া ছাড়াও কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ করে কৃত্রিম উপায়ে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে সমুদ্রে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব উপকূল এলাকায় এ ব্যাপারে ব্যাপক গণ সচেতনতা অভিযানও পরিচালনা করা হয়েছে। এজন্য লিফলেট, পোষ্টার, সামুদ্রিক কচ্ছপের ছবি সংবলিত ক্যাপ এবং টি শার্ট বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বিলবোর্ডও টানানো হয়েছে। CNRS-এর অভিজ্ঞতা এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সমমনাদের অবহিত করা হয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে। ২০০০ এবং ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অরল্যান্ডো এবং ফিলাডেলফিয়ায় আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষণ এবং জীববিজ্ঞান সিম্পোজিয়াম এবং মালয়শিয়ার কোটা কিনাবালুতে দ্বিতীয় এশীয় সামুদ্রিক কচ্ছপ সংক্রান্ত সিম্পোজিয়ামে মৌখিক উপস্থাপনা এবং পোস্টার প্রদর্শন করা হয়েছে।

সংরক্ষণ এলাকা
- তীরবর্তী এলাকা
- সেন্ট মার্টিন
- শাহপরী দ্বীপ
- মাতারবারী
- ইনানি
- কুতুবদিয়া

সংরক্ষণে করণীয়
- কচ্ছপ সংরক্ষণে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে নিবিবিলি বাসা বাঁধা ও ডিম পাড়ার জায়গা ঘোষণা করা
- মুষলধারে বৃষ্টি থেকে সমুদ্র তীরবর্তী বালুর ঢিপি রক্ষার্থে প্রকল্প গ্রহণ
- ডিম পাড়ার জায়গা শিলা মুক্ত রাখা
- মৎস্যজীবিদের উদ্বুদ্ধ করা এবং জাল কেটে কচ্ছপ ছেড়ে দেয়ার জন্য তাদের ক্ষতি পুরণের ব্যবস্থা করা
- ডিম পাড়ার জায়গা বাদ দিয়ে বোতার জাল স্থাপন করা
- কুকুরের দ্বারা কচ্ছপের বাসা নিধন এবং ডিম চুরি বন্ধ করা

এম মোখলেসুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, Center for Natural Resources Studies (CNRS); যোগাযোগ cnrs@bdmail.net

জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্প ঃ দিক নির্দেশনার প্রয়োজন

চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে জাহাজ ভাঙ্গা কার্যক্রমশুরু হয় ১৯৬৯ সালে। এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে সমুদ্র বাণিজ্য অধিদপ্তর। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ এবং আরো কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান জড়িত। ফৌজদারহাট উপকূলীয় অঞ্চলকে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের স্বর্গ বলা যেতে পারে, কারণ এটি একটি দীর্ঘ সমতলীয় জোয়ার-ভাটার এলাকা, এখানে শ্রম সহজলভ্য, ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং রেল যোগাযোগ থাকায় রয়েছে সহজ পরিবহণ ব্যবস্থা এবং এখানকার আবহাওয়া মোটমুটি ভাবে স্থিতিশীল। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত জাহাজ ভাঙ্গার একটি পরিসংখ্যান গ্রাফে দেখানো হলো।

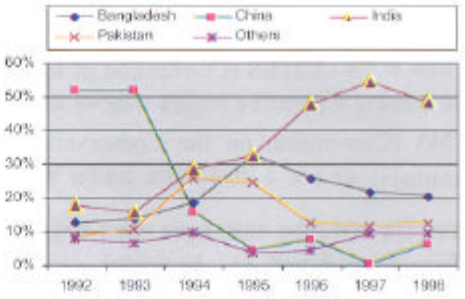

বর্তমানে এখানে আনুমানিক ৫০টি জাহাজভাঙ্গার কারখানা আছে। উঁচু জোয়ারের সময় প্রপেলারের সাহায্যে জাহাজগুলোকে সৈকতে আনা হয়। নিম্ন জোয়ারের সময় এগুলোকে নামিয়ে রাখা হয়। জাহাজগুলোকে কেটে কতগুলো অংশে ভাগ করা হয় এবং উঁচু জোয়ারের সময় শেকলযুক্ত কপিকলের সাহায্যে টেনে তীরে আনা হয়। অপেক্ষাকৃত বড় অংশগুলোকে পরিবহনের সুবিধার্থে সৈকতেই কেটে আরো ছোট ছোট টুকরা করা হয়। মূল্যবান জিনিসগুলো (যেমন ছোট মোটর, পাম্প, নৌযান-যন্ত্রপাতি, জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক তার এবং তৈজসপত্র ইত্যাদি) খুলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুই পাশে পুরনো মার্কেটে বিক্রি করে দেয়া হয়। একটি বড় ট্যাংকার সম্পূর্ণ ভাঙ্গতে ৫/৬ মাস সময় লাগে।

ইস্পাত কারখানা, ইস্পাত প্লেট পুনউৎপাদন, এ্যাসবেসটস পুনউৎপাদন, লুব্রিকেটিং অয়েল তৈরী এবং অন্যান্য শিল্পে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প অবদান রাখে।

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, কারণ এর ফলে ইস্পাত সামগ্রীর আমদানী কমে যার ফলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়। এছাড়া এখান থেকে নানা রকম কর পাওয়া যায় যেমন আমদানী কর (৭.৫%)আঙ্গিনা কর (yard tax) (২.৫%) ইত্যাদি। এখাত সরকারকে বছরে প্রায় ৫ কোটি মার্কিন ডলার প্রদান করে। আনুমানিক ৫০,০০০ মানুষ সরাসরি জাহাজভাঙ্গার কাজ করে। আরো দু'লাখ মানুষ জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত রয়েছে।

আমাদের উপকূলীয় পরিবেশের ওপর জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। জাহাজ ভাঙ্গা কাজের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-নীতি মানা হয়না, পরিবেশ এবং শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাও অনুসরণ করা হয়না। সমুদ্রের পানিতে Heavy Metal, দূষিত পানি এবং তেল ফেলা হয়। এ ছাড়াও পানিতে তৈলাক্ত ফিল্ম ছড়িয়ে পড়ায় আলোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বাঁধাগ্রস্ত হয়। পরিণামে খাদ্য শেকল বা Food Chain-প্রক্রিয়াওবাধাগ্রস্ত হয়। পলি সাইক্লিক এ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (PAH)-এবং অন্যান্য অপরিশোধিত তেল পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। সামুদ্রিক পরিবেশ, বিশেষ করে সামুদ্রিক পাখীদের জন্য এগুলোর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। এছাড়া ভারী পদার্থ, রং, তেজস্ক্রিয়া বিকিরণকারী পদার্থ পানিকে এমনভাবে দূষিত করছে যা অন্যান্য জীবের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। বড় বড় জাহাজ এবং জাহাজের টুকরো তীরে টেনে আনার ফলে সাগরতীরের মাটি তার স্বাভাবিক অবস্থা হারাচ্ছে। ফলে সাগরতীরে ভূমি ক্ষয়ের মাত্রা বাড়ছে। এ্যাসবেস্টস গুড়া করে পাউডার তৈরীর সময় বাতাসে এর ছাই ছড়িয়ে পড়ে যা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর জন্য শ্বাসকষ্টের কারণ হয়। এর ফলে ফুসফুসের নানা রকম রোগ যেমন-হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি হয়। জাহাজ কাটার প্রক্রিয়ায়যে ক্ষতিকর গ্যাস উৎপন্ন হয় তা শ্বাসকষ্ট এবং হাঁপানী রোগের কারণ হয়। জাহাজ থেকে সৃষ্টি সকল দূষণকারী উপাদান খাদ্য শেকলে প্রবেশ করে জীবদেহে পুঞ্জীভূত হয় এবং নানারকম রোগের সৃষ্টি করে।

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে শ্রমিক দুর্ঘটনা একটি স্বাভাবিক চিত্রে পরিণত হয়েছে। বড় বড় এবং ভারী পাতগুলো কাটার পর শ্রমিকরা কাঁধে করে তা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। এই পাতগুলো বহনকালে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে- এমনকি তা শ্রমিকের মৃত্যুর কারণও হয়। বর্ষাকালে শ্রমিকদের দুর্ঘটনা বেশী হয়। কারণ যেখানে জাহাজভাঙ্গা হয় সেখানে ভালো রাস্তা নেই। এছাড়া, এমনকি বর্ষার সময়ও শ্রমিকদের খালি পায়ে কাজ করতে হয়। ফলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। এগুলো ছাড়াও বিস্ফোরণ এবং আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এতে অজ্ঞাত সংখ্যক শ্রমিক প্রতিবছর মারা যায় কিংবা পঙ্গু হয়।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংস্থা একটি নৌযানের স্থায়ীত্বকাল ২৫ বছর নির্ধারণ করে দিয়েছে। ফলে আগামী বছরগুলোতে চট্টগ্রামের সৈকত গুলোতে জাহাজ ভাঙ্গা কার্যক্রম আরো বাড়বে বলে আশা করা যায়। তাই এ শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে এ কাজের জন্য উপযোগি পরিবেশ বজায় রাখতে হবে সেই সাথে উপকূল এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণেও ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে নির্দেশনা তৈরীতে সরকারের তদারকী ব্যবস্থা প্রয়োজন যাতে করে জাহাজ ভাঙ্গা কাজ ভালো ভাবে করা যায়, মানব সম্পদ এবং সম্পদে-পরিপূর্ণ সমুদ্র উপকূলের পরিবেশ সংরক্ষণ করা যায়।

ড. ইউসুফ শরিফ আহমেদ খান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইল- yusuf@abnetbd.com এবং সরদার এম, এ, জব্বার, ই-মেইল- jabberctg@yahoo.com

প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত সমীক্ষা শুরু

প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত পদ্ধতির গভীর বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা পালনকারী এবং তার সহায়ক আইনগত উপাদানের সমন্বয়ের কর্মপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা-যা উপকূলবর্তী মানুষের জীবিকা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোকে কেন্দ্র করে প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত পদ্ধতির কেস ষ্টাডির মাধ্যমে এ বিশ্লেষণ পরিচালনা করা হবে। প্রাথমিকভাবে ইস্যুগুলো হবে– বসতি, চিংড়ি চাষ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। চিংড়ি চাষের ওপর কেস স্টাডি এখন চলছে। চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, Fisheries Future and Fry Collection Action Plan-এর অধীনে যে সমীক্ষা এবং কার্যক্রম চলছে তার ফলাফলকে এ কেস স্টাডির বিবেচনায় আনা হবে। কেস-স্টাডিতে অন্ততঃ যে সব বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে সেগুলো হলো- চাষ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট ইস্যু চিহ্নিতকরণ এবং তার প্রতিকার; এ কর্মকাণ্ডে জড়িতদের চিহ্নিতকরণ ; তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ ; তাদের কাছে সহজলভ্য আইনের উপাদান গুলো চিহ্নিতকরণ এবং তারা কিভাবে এর ব্যবহার করে তা বিশ্লেষণ ; দক্ষতা এবং কার্যকারিতার ওপর মন্তব্য করা এবং এর উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

অন্যান্য কেস স্টাডিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সংবাদপত্রে উপকূল

- ঝড়-ঝলোচ্ছাসে লক্ষীপুরের চরাঞ্চলে ব্যাপক প্রাণহানীর আশংকা (যুগান্তর, ১৬ই এপ্রিল ২০০২)
- সন্দ্বীপে বঙ্গোপসাগরে ২শ' কিলোমিটারব্যাপী নতুন চর জেগেছে (ইনকিলাব, ৩রা এপ্রিল ২০০২)
- সুন্দরবন সংলগ্ন শ্যামনগরে লবণ চাষের প্রসার-লাভ (জনকন্ঠ ৬ই এপ্রিল ২০০২)
- বঙ্গোপসাগরে ভয়াবহ দূষণ। কক্সবাজারে টন টন শামুক মরে ভেসে উঠছে তীরে (জনকন্ঠ ৯ই এপ্রিল ২০০২)
- কুয়াকাটায় পর্যটন পল্লী ও বিমান বন্দর হবে (যুগান্তর ২০শে এপ্রিল ২০০২)
- ভাঙ্গনের মুখে সেন্টমার্টিন দ্বীপ। ২০টি বাড়ি বিলীন। (জনকন্ঠ ২৯শে জুন, ২০০২)
- ৩০ বছরে এক লাখ ৩৫ হাজার লোক নিহতঃ ঝড়-ঝলোচ্ছাসের সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে আছে হাতিয়া দ্বীপবাসী (ইত্তেফাক ৫ই মে, ২০০২)
- বাগের হাটে দু'হাজার চিংড়ি ঘের প্লাবিত (জনকন্ঠ ১৬ই জুন ২০০২)
- লক্ষীপুরে চর থেকে বালি উত্তোলন অব্যাহত ফসলি জমি হুমকির মুখে (যুগান্তর ১৭ই জুন ২০০২)
- চিংড়ির মত কাঁকড়াও বড় রফতানী পণ্য হতে পারে (জনকন্ঠ ১লা মে ২০০২)

আদমশুমারী ২০০১

	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ
প্রশাসনিক পরিসংখ্যান		
জেলা	১৬	৬৪
উপজেলা/থানা	১৩১	৫০৭
ইউনিয়ন	১১৫৪	৪৪৮৪
গ্রাম	১৪৫৭৮	৮৭৩১৯
পৌরসভা	৬০	২২৩
জনসংখ্যা		
মোট (মিলিয়ন)	৩০.৬	১২৩.২
পুরুষ (মিলিয়ন)	১৫.৫	৬২.৭
মহিলা (মিলিয়ন)	১৫.১	৬০.৪
মহিলা/পুরুষের আনুপাতিক হার	১০২.২	১০৩.৮
খানা		
নম্বর (০০০)	৫৯৭৭	২৫৩৬২
পরিবার	৫.১	৪.৮

ওয়েব সাইট

২০০১ সালের নভেম্বরে PDO-ICZM ওয়েব সাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েব সাইটে PDO-ICZM সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পগুলোর তালিকা দেয়া হয়েছে। এছাড়া কার কি দায়িত্ব, সকল রিপোর্ট ও প্রকাশনা সমুহ, Coast News এর কপি, সকল TC সভার কার্যবিবরণী এবং আরো অনেক বিষয় ওয়েব সাইটে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ওয়েব সাইটের ওপর আপনার মন্তব্যকে স্বাগত জানানো হবে।

সাইটের ঠিকানা হচ্ছে- www.iczmpbangladesh.com

Reducing Vulnerability to Climate Change প্রকল্প : একটি পরিচিতি

এ ধরণের প্রকল্প বাংলাদেশে এই প্রথম। এটি একটি তিন বছরের প্রকল্প-২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৫ সালের মার্চ পর্যন্ত। এতে অর্থ যোগান দিচ্ছে ক্যানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (CIDA)। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি জেলায় কাজ করা হবে। জেলাগুলো হচ্ছে-বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, যশোর, খুলনা, নড়াইল এবং সাতক্ষীরা। স্থানীয় এনজিও এবং জনসাধারণের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এ কাজ করা হবে। প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য ঐ এলাকার মানুষের ধারণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তা পূর্বানুমান করা এবং এর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ইস্যুগুলির সপক্ষে প্রচার চালানো।

এখন পর্যন্ত RVCC দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ঝুঁকি বিশে-ষণ (vulnerability assessment) কাজ সম্পন্ন করেছে। এ কাজে অন্যান্য অংশীদারদের নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন : *Claudia Schaerer*, প্রকল্প সমন্বয়কারী, *RVCC* প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ, খুলনা
মাঠ পর্যায়ে অফিস : বাড়ি # ১৪, সড়ক # ১১৩, খালিশপুর হাউজিং, খুলনা। ফোন : ০৪১-৭৬১২৫০, মোবাইল : ০১৭৮১৮৯৯৫, ই-মেইল carervcc@khulna.bangla.net

Please note Change of e-mail from pdo@bangla.net to pdo@iczmpbd.org

PDO-ICZM সম্পর্কে কিছু তথ্য

PDO-ICZM গঠিত এবং পরিচালিত হয় আন্ত:মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে প্রধান মন্ত্রণালয়।

এর উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

-উপকূলবর্তী এলাকার উন্নয়নের জন্য একটি নীতি এবং কাঠামো চিহ্নিত করা এবং এর জন্য কর্মকৌশল তৈরী করা :

-সাইক্লোন ও জলোচ্ছাসে প্রাণহানি এবং সম্পত্তি ধ্বংসের ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থা নির্ধারণ-প্রাকৃতিক দুর্যোগের তাৎক্ষনিক ধাক্কা সামাল দেয়া এবং মর্যাদার সাথে যাতে ক্ষয়ক্ষতি সামলে উঠতে পারে সে জন্য স্থানীয় জনগনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

-দুর্যোগের ঝুঁকি এবং দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি কর্মকৌশল তৈরী করা। এতে দুর্যোগ প্রতিরোধ, জরুরী সাড়া এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সামলে উঠার পর্যায় অন্তর্ভূক্ত থাকবে:

-উপকূলবর্তী অঞ্চলের উন্নয়নে এমন একটি কর্ম-প্রক্রিয়া চালু করা যাতে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং সাহায্যদাতাদের সমর্থনে ঐ অঞ্চলে কর্মরত প্রকল্পগুলোর নীতি, কর্মসূচী এবং কার্যপদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় ;

-উপকূলের উন্নয়নে সুশীল সমাজের (স্থানীয় জনগনসহ) সক্ষমতা এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি কর্মকৌশল তৈরী ;

-উপকূলবর্তী অঞ্চলে জীবিকা উন্নয়ন এবং ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে কর্মকৌশল এবং কার্যক্রম চিহ্নিত করণ ;

-উপকূলবর্তী অঞ্চলের উন্নয়নে জ্ঞানের ভিত্তি সম্প্রসারণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং একটি তদারকি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরী করা;

-ICZM এর প্রস্তুতি পর্যায়ে PDO ২০০৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করবে।

তটরেখার পরবর্তী সংখ্যা বের হবে এবছরের অক্টোবর মাসে। উপকূলীয় অঞ্চল সংক্রান্ত তথ্য ও সংবাদ বাংলা ও ইংরেজীতে পাঠানোর আহ্বান রইল।

নেদারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশ সরকার PDO-ICZM এ অর্থায়ন করছে।
এটি পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি প্রকল্প

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুণ
Program Development Office for ICZM
সাইমন সেন্টার
বাড়ি # ৪/এ, রোড # ২২, গুলশান-১, ঢাকা -১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮২৬৬১৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল: pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট: www.iczmpbangladesh.com

WARPO Office
সাইমন সেন্টার (৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৪/এ, রোড # ২২, গুলশান-১, ঢাকা -১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮১৪৫৫৪/৮৮১৪৫৫৬/৮৮১৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮২৬৬৬৩
ই-মেইল : dg_warpo@bangla.net
ওয়েব সাইট: www.warpo.org

তটরেখা

টিকেট